আল মুয্যাম্মিল

৭৩

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের المزمل শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটা শুধু সূরাটির নাম, এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার দু'টি রুকূ' দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে।

প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো মক্কায় নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। এর বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকেও তা বুঝা যায়। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, মক্কী জীবনের কোন্ পর্যায়ে তা নাযিল হয়েছিল? হাদীসের বর্ণনাসমূহ থেকে আমরা এর কোন জবাব পাই না। তবে পুরো রুকূ'টির বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা এর নাযিল হওয়ার সময়–কাল নির্ণয় করতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রথমত, এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের বেলা উঠে আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তাঁর মধ্যে নবুওয়াতের গুরু দায়িত্ব বহনের শক্তি সৃষ্টি হয়। এ থেকে জানা গেল যে, এ নির্দেশটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রথম যুগে এমন এক সময় নাযিল হয়ে থাকবে যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ পদমর্যাদার জন্য তাঁকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে তাঁকে তাহাজ্জুদ নামাযে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশী রাত পর্যন্ত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তখন পর্যন্ত কুরআন মজীদের অন্তত এতটা পরিমাণ নাযিল হয়েছিল যা দীর্ঘক্ষণ তিলাওয়াত করা যেতো।

তৃতীয়ত, এ রুকূ'তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরোধীদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের উপদেশ এবং মক্কার কাফেরদের আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রুকূ'টি যখন নাযিল হয়েছিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রকাশ্য তাবলীগ বা প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন এবং মক্কায় তাঁর বিরোধিতাও তীব্রতা লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় রুকূ' সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ যদিও বলেছেন যে, এটিও মক্কায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুফাস্সির একে মদীনায় অবতীর্ণ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ রুকূ'টির বিষয়বস্তু থেকে এ মতটিরই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এর মধ্যে আল্লাহর পথে লড়াই করার উল্লেখ আছে। মক্কায় এর কোন প্রশ্নই ছিল না। এতে ফরযকৃত যাকাত আদায়

করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এটা প্রমাণিত বিষয় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে যাকাত দেয়া মদীনাতে ফরয হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

প্রথম সাতটি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে মহান কাজের গুরু দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে তার দায়–দায়িত্ব ঠিকমত পালনের জন্য আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন। এর বাস্তব পন্থা বলা হয়েছে এই যে, আপনি রাতের বেলা উঠে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশী সময় বা কিছু কম সময় পর্যন্ত নামায পড়ুন।

৮ থেকে ১৪নং পর্যন্ত আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্র বিশ্ব–জাহানের অধিপতি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে যান। নিজের সমস্ত ব্যাপার তাঁর কাছে সোপর্দ করে দিয়ে নিঃশংক ও নিশ্চিন্ত হয়ে যান। বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে যা বলছে সে ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করুন, তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। তিনিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন।

এরপর ১৫ থেকে ১৯ নম্বর পর্যন্ত আয়াতে মক্কার যে সমস্ত মানুষ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছিলো তাদের এ বলে হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে যে, আমি যেমন ফেরাউনের কাছে রসূল পাঠিয়েছিলাম ঠিক তেমনি তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি। কিন্তু দেখো, আল্লাহর রসূলের কথা না শুনে ফেরাউন কিরূপ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছিল। মনে করো, এ জন্য দুনিয়াতে তোমাদের কোন শাস্তি দেয়া হলো না। কিন্তু কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে তোমরা কিভাবে নিষ্কৃতি লাভ করবে?

এ পর্যন্ত যা বর্ণিত হলো তা প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়েরের বর্ণনা অনুসারে এর দশ বছর পর দ্বিতীয় রুকূ'টি নাযিল হয়েছিল। তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে প্রথম রুকূ'র শুরুতেই যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এতে তা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এখন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তাহাজ্জুদ নামায যতটা সহজে ও স্বাচ্ছন্দে আদায় করা সম্ভব সেভাবেই আদায় করবে। তবে মুসলমানদের যে বিষয়টির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তাহলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতাসহ আদায় করবে। যাকাত যেহেতু ফরয তাই তা যথাযথভাবে আদায় করবে এবং আল্লাহর পথে নিজের অর্থ–সম্পদ বিশুদ্ধ নিয়তে খরচ করবে। সবশেষে মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে তোমরা যেসব কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেবে তা ব্যর্থ হবে না। বরং তা এমন সব সাজ–সরঞ্জামের মত যা একজন মুসাফির তার স্থায়ী বাসস্থানে আগেই পাঠিয়ে দেয়। আল্লাহর কাছে পৌছার পর তোমরা তার সবকিছুই পেয়ে যাবে যা দুনিয়া থেকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলে। আগেভাগেই পাঠিয়ে দেয়া এসব সরঞ্জাম–সামগ্রী তোমরা দুনিয়াতে যা ছেড়ে যাবে তার চেয়ে যে শুধু ভাল তাই নয়, বরং আল্লাহর কাছে তোমরা তোমাদের আসল সম্পদের চেয়ে অনেক বেশী পুরস্কারও লাভ করবে।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ﴿۱﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿۲﴾ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ﴿۳﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ﴿۴﴾ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿۵﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ؕ﴿۶﴾ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ؕ﴿۷﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ؕ﴿۸﴾

হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী[১] রাতের বেলা নামাযে রত থাকো। তবে কিছু সময় ছাড়া[২] অর্ধেক রাত, কিংবা তার চেয়ে কিছু কম করো। অথবা তার ওপর কিছু বাড়িয়ে নাও।[৩] আর কুরআন থেমে থেমে পাঠ করো।[৪] আমি অতি শীঘ্র তোমার ওপর একটি গুরুভার বাণী নাযিল করবো।[৫] প্রকৃতপক্ষে রাতের বেলা জেগে ওঠা[৬] প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশী কার্যকর[৭] এবং যথাযথভাবে কুরআন পড়ার জন্য উপযুক্ত সময়[৮] দিনের বেলা তো তোমার অনেক ব্যস্ততা রয়েছে। নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাকো[৯] এবং সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই জন্য হয়ে যাও।

১. এ শব্দগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন রাতের বেলা ওঠেন এবং ইবাদাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন অথবা ঘুমানোর জন্য চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। এ সময় তাঁকে হে নবী (স) অথবা হে রসূল বলে সম্বোধন না করে হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী বলে সম্বোধন একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্বোধন। এর যে অর্থ দাঁড়ায় তা হলো, এখন আর সে সময় নেই যখন তিনি নিশ্চিন্তে আরামে ঘুমাতেন। এখন তাঁর ওপর এমন এক বিরাট কাজের বোঝা চাপানো হয়েছে যার দাবী ও চাহিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

২. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, নামাযে দাঁড়িয়ে রাত অতিবাহিত করো এবং রাতের অল্প কিছু সময় মাত্র ঘুমে কাটাও। দুই, তোমার কাছে সমস্ত রাতই নামায পড়ে কাটিয়ে দেয়ার দাবী করা হচ্ছে না। বরং তুমি বিশ্রামও করো এবং রাতের একটা ক্ষুদ্র

অংশ ইবাদাত–বন্দেগীতেও ব্যয় করো। কিন্তু পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে প্রথমোক্ত অর্থটাই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূরা দাহরের ২৬নং আয়াত থেকে একথারই সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً

"রাতের বেলা আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে থাকো এবং রাতের বেশীর ভাগ সময় তাঁর তাসবীহ ও প্রশংসায় অতিবাহিত করো।"

৩. যে সময়টুকু ইবাদাত করে কাটাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সে সময়ের পরিমাণ কি হবে এটা তারই ব্যাখ্যা। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তিনি ইচ্ছা করলে অর্ধেক রাত নামায পড়ে কাটাতে পারেন কিংবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী করতে পারেন। তবে বাচনভঙ্গী থেকে বুঝা যায় যে, অর্ধেক রাত–ই অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ অর্ধেক রাতকে মানদণ্ড নির্ধারিত করে তার থেকে কিছু কম বা তার চেয়ে কিছু বেশী করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ও দ্রুতগতিতে পড়ো না। বরং ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ সুন্দরভাবে মুখে উচ্চারণ করে পড়ো। এক একটি আয়াত পড়ে থেমে যাও যাতে মন আল্লাহর বাণীর অর্থ ও তার দাবীকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে এবং তার বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোন জায়গায় আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর উল্লেখ থাকলে তার মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও ভীতি যেন মনকে ঝাঁকুনি দেয়। কোন জায়গায় তাঁর রহমত ও করুণার বর্ণনা আসলে হৃদয়–মন যেন কৃতজ্ঞতার আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে। কোন জায়গায় তাঁর গযব ও শাস্তির উল্লেখ থাকলে হৃদয়–মন যেন তার ভয়ে কম্পিত হয়। কোথাও কোন কিছু করার নির্দেশ থাকলে কিংবা কোন কাজ করতে নিষেধ করা হয়ে থাকলে কি কাজ করতে আদেশ করা হয়েছে এবং কোন্ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা যেন ভালভাবে বুঝে নেয়া যায়। মোট কথা কুরআনের শব্দগুলো শুধু মুখ থেকে উচ্চারণ করার নাম কুরআন পাঠ নয়, বরং মুখ থেকে উচ্চারণ করার সাথে সাথে তা উপলব্ধি করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনাও করতে হবে। হযরত আনাসকে (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, শব্দগুলোকে টেনে টেনে পড়তেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে বললেন যে, তিনি আল্লাহ, রাহমান এবং রাহীম শব্দকে মদ্দ করে বা টেনে পড়তেন। (বুখারী) হযরত উম্মে সালামাকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থামতেন। যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়ে থামতেন, তারপর اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে থামতেন এবং কিছু সময় থেমে থেকে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়তেন। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) আরেকটি রেওয়ায়াতে হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেকটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়তেন। (তিরমিযী, নাসায়ী) হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম, তিনি

এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছেন যে, যেখানে তাসবীহের বিষয় আসছে সেখানে তিনি তাসবীহ পড়ছেন, যেখানে দোয়ার বিষয় আসছে সেখানে দোয়া করছেন এবং যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় আসছে সেখানে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। (মুসলিম, নাসায়ী) হযরত আবু যার বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাতের নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটির কাছে পৌছলেন اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ "তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও তাহলে তুমি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ) তখন তিনি বার বার এ আয়াতটিই পড়তে থাকলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেল।" (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী)

৫. এর অর্থ হলো তোমাকে রাতের বেলা নামায পড়ার এ নির্দেশ এ জন্য দেয়া হচ্ছে যে, আমি একটি অতি গুরুভার বাণী তোমার ওপরে নাযিল করছি। এ ভার বহন করার এবং তা বরদাশত করার শক্তি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। তুমি এ শক্তি অর্জন করতে চাইলে আরাম পরিত্যাগ করে রাতের বেলা নামাযের জন্য ওঠো এবং অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী রাত ইবাদাত বন্দেগীতে কাটিয়ে দাও। কুরআনকে গুরুভার বাণী বলার কারণ হলো, তার নির্দেশ অনুসারে কাজ করা, তার শিক্ষার উদাহরণ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা, সারা দুনিয়ার সামনে তার দাওয়াত বা আহবান নিয়ে দাঁড়ানো এবং তদনুযায়ী আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, নৈতিক চরিত্র ও আচার-আচরণ এবং তাহযীব-তামাদ্দুনের গোটা ব্যবস্থায় বিপ্লব সংঘটিত করা এমন একটি কাজ যে, এর চেয়ে বেশী কঠিন ও গুরুভার কাজের কল্পনাও করা যায় না। এ জন্যও একে গুরুভার ও কঠিন বাণী বলা হয়েছে যে, তার অবতরণের ভার বহন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি আমার উরুর ওপর তাঁর উরু ঠেকিয়ে বসেছিলেন। আমার উরুর ওপর তখন এমন চাপ পড়ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো তা এখনই ভেঙে যাবে। হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন ঃ আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হতে দেখেছি। সে সময়ও তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকতো। (বুখারী, মুসলিম, মালিক, তিরমিযী, নাসায়ী) আরেকটি রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ উটনীর ওপর সওয়ার থাকা অবস্থায় যখনই তাঁর ওপর অহী নাযিল হতো উটনী তখন তার বুক মাটিতে ঠেকিয়ে দিতো। অহী নাযিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারতো না। (মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, ইবনে জারীর)।

৬. মূল ইবারাতে نَاشِئَةَ الَيْلِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সির ও ভাষাবিদদের চারটি ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। একটি মত হলো, نَاشِئَة শব্দের মানে রাতের বেলা শয্যা ত্যাগকারী ব্যক্তি। দ্বিতীয় মতটি হলো এর অর্থ রাত্রিকালীন সময়। তৃতীয় মত হলো এর অর্থ রাতের বেলা জেগে থাকা বা ওঠা। আর চতুর্থ মতটি হলো, এর অর্থ শুধু রাতের বেলা ওঠা বা জেগে থাকা নয়। বরং ঘুমিয়ে পড়ার পর জেগে ওঠা। হযরত আয়েশা এবং মুজাহিদ এ চতুর্থ অর্থটিই গ্রহণ করেছেন।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ
وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ
قَلِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾
يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাই তাঁকেই নিজের উকীল হিসেবে গ্রহণ করো।[১০] *আর লোকেরা যা বলে বেড়াচ্ছে সে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করো এবং ভদ্রভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।*[১১] *এসব মিথ্যা আরোপকারী সম্পদশালী লোকদের সাথে বুঝাপড়ার ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।*[১২] *আর কিছু কালের জন্য এদেরকে এ অবস্থায়ই থাকতো দাও। আমার কাছে (এদের জন্য) আছে শক্ত বেড়ি,*[১৩] *জ্বলন্ত আগুন, গলায় আটকে যাওয়া খাবার এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব। এসব হবে সেদিন যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা কেঁপে উঠবে এবং পাহাড়গুলোর অবস্থা হবে এমন যেন বালুর স্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে।*[১৪]

৭. আয়াতে أَشَدُّ وَطْـًٔا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এতো ব্যাপক যে, একটি মাত্র বাক্যে তা বুঝানো সম্ভব নয়। এর একটি অর্থ হলো, রাতের বেলা ইবাদাত–বন্দেগীর জন্য শয্যা ত্যাগ করে ওঠা এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা যেহেতু মানুষের স্বভাব–বিরুদ্ধ কাজ, মানুষের মন ও প্রবৃত্তি এ সময় আরাম কামনা করে, তাই এটি এমন একটি কাজ ও চেষ্টা–সাধনা যা প্রবৃত্তিকে অবদমিত ও বশীভূত করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর পন্থা। যে ব্যক্তি এ পন্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয় এবং দেহ ও মন–মগজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের এ শক্তিকে আল্লাহর পথে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সত্য ও শাশ্বত এ দীনের দাওয়াতকে পৃথিবীতে বিজয়ী করার কাজ করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, এ কাজটি মানুষের হৃদয়–মন ও বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার একটা কার্যকর উপায়। কারণ রাতের এ সময়টিতে বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে আর কেউ আড়াল হয় না। এ অবস্থায় মানুষ মুখে যা বলে তা তার হৃদয়ের কথার প্রতিধ্বনি। তৃতীয় অর্থ হলো, এটি মানুষের ভেতর ও বাহিরের মধ্যে সংগতি ও মিল সৃষ্টির অতি কার্যকর একটি উপায়। কারণ যে ব্যক্তি রাতের নির্জন নিথর পরিবেশে আরাম পরিত্যাগ করে ইবাদাত–বন্দেগীর জন্য উঠবে সে নিসন্দেহে খালেস মনেই এরূপ করবে। তাতে প্রদর্শনীর বা লোক দেখানোর আদৌ কোন সুযোগ থাকে না। চতুর্থ অর্থ হলো, মানুষের জন্য এ ধরনের ইবাদাত–বন্দেগী যেহেতু দিনের বেলার ইবাদাত–বন্দেগীর চেয়ে অনেক বেশী কষ্টকর। তাই তা নিয়মিত করার ফলে মানুষের মধ্যে অনেক বেশী দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়,

সে অত্যন্ত শক্ত হয়ে আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে পারে এবং এ পথের কঠোরতাসমূহকে সে অটল ও অবিচল থেকে বরদাশত করতে পারে।

৮. মূল ইবারতে أَقْوَمُ قِيْلًا বলা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো, 'কথাকে আরো বেশী যথার্থ ও সঠিক বানায়।' তবে এর মূল বক্তব্য হলো, সে সময় মানুষ আরো বেশী প্রশান্তি, তৃপ্তি ও মনোযোগ সহকারে বুঝে কুরআন শরীফ পড়তে পারে। ইবনে আব্বাস (রা) এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে اجدران يفقه فى القران অর্থাৎ গভীর চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশসহ কুরআন পাঠের জন্য এটা একটা অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সময়। (আবু দাউদ)

৯. দিনের বেলার ব্যস্ততার উল্লেখ করার পর 'তোমার রবের নাম স্মরণ করতে থাকো' এ নির্দেশ দেয়া থেকে আপনা আপনি একথাটি প্রকাশ পায় যে, দুনিয়াতে হাজারো কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও তোমার রবের স্মরণ থেকে গাফেল যেন না হও। বরং কোন না কোনভাবে তাকে স্মরণ করতে থাকো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা ৬৩)

১০. উকীল বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার প্রতি আস্থা রেখে কোন ব্যক্তি নিজের ব্যাপার তার ওপর সোপর্দ করে। উর্দু ভাষাতে প্রায় এ অর্থেই আমরা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উকীল শব্দটি ব্যবহার করি আমাদের মামলা-মোকদ্দমা যার হাতে অর্পণ করে কেউ এতটা নিশ্চিন্ত হয়ে যায় যে, সে তার পক্ষ থেকে ভালভাবেই মামলাটি লড়বে এবং তার নিজের এ মামলা লড়ার কোন দরকার হবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতটির অর্থ হলো, দীনের দাওয়াত পেশ করার কারণে তোমার বিরোধিতার যে তুফান সৃষ্টি হয়েছে এবং তোমার ওপর যেসব বিপদ-মুসিবত আসছে সে জন্য তুমি অস্থির বা উৎকণ্ঠিত হয়ো না। তোমার প্রভু তো সেই সত্তা যিনি পূর্ব ও পশ্চিম তথা সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক। ইলাহী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁর ছাড়া আর কারো হাতে নেই। তুমি তোমার সমস্ত ব্যাপার তাঁর হাতে সোপর্দ করে দাও এবং নিশ্চিন্ত হয়ে যাও যে, এখন তোমার মোকদ্দমা তিনি নিজে লড়বেন, তোমার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে তিনিই বুঝাপড়া করবেন এবং তোমার সব কাজ তিনিই সম্পন্ন করবেন।

১১. 'আলাদা হয়ে যাও' কথাটির অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইসলামের তাবলীগের কাজ বন্ধ করে দাও। বরং এর অর্থ হলো, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না, তাদের অন্যায় ও অর্থহীন আচরণ উপেক্ষা করে চলো এবং তাদের কোন অভদ্র আচরণের জবাব দিও না। তবে তাদের প্রতি এ উপেক্ষা এবং নির্লিপ্ততাও যেন কোন প্রকার ক্ষোভ, ক্রোধ এবং বিরক্তিসহ না হয়। বরং তা যেন এমন উপেক্ষা হয়, যেমন একজন ভদ্র মানুষ কোন অসভ্য বাউণ্ডেলে বা বখাটে লোকের গালি শুনে যেমন তা উপেক্ষা করে এবং মনকে ভারাক্রান্ত হতে পর্যন্ত দেয় না। এ থেকে এরূপ ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া ঠিক নয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মপদ্ধতি বোধ হয় এ থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল। তাই আল্লাহ তাঁকে এ আদেশ করেছেন। তিনি মূলত প্রথম থেকেই এ কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করছিলেন। তবে কুরআনে এ নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, তোমরা যে আচরণ করছো তার জবাব না দেয়ার কারণ দুর্বলতা নয়। বরং এরূপ আচরণের জবাবে আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ ধরনের ভদ্রজনোচিত পন্থা গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছেন।।

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

আমি তোমাদের[১৫] নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছি তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ[১৬] যেমন ফেরাউনের নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম। দেখো, ফেরাউন যখন সে রসূলের কথা মানলো না তখন আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম। তোমরা যদি মানতে অস্বীকার করো তাহলে সেদিন কিভাবে রক্ষা পাবে যেদিনটি শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে?[১৭] যেদিনের কঠোরতায় আকাশ মণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকবে? আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তো পূর্ণ হবেই। এ একটি উপদেশ বাণী। অতএব যে চায় সে তার প্রভুর পথ অবলম্বন করুক।

১২. একথা থেকে এ মর্মে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে, মক্কায় যেসব লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করছিল এবং নানাভাবে ধোঁকা দিয়ে এবং নানা রকমের স্বার্থপ্রীতি সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ উস্কে দিয়ে তাঁর বিরোধিতায় নামছিল তারা সবাই ছিল জাতির সচ্ছল, সম্পদশালী ও বিলাসপ্রিয় মানুষ। কারণ ইসলামের এ সংস্কার আন্দোলনের আঘাত তাদের স্বার্থের ওপর সরাসরি পড়ছিল। কুরআন আমাদের বলে যে, এ আচরণ শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই ছিল না বরং এ গোষ্ঠী চিরদিনই সংস্কার ও সংশোধনের পথ রুদ্ধ করার জন্য জগদ্দল পাথরের মত বাধা সৃষ্টি করে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৬০, ৬৬, ৭৫, ৮৮; আল মু'মিনূন, ৩৩; সাবা, ৩৪ ও ৩৫ এবং আয যুখরুফ, ২৩)

১৩. জাহান্নামে পাপী ও অপরাধীদের পায়ে ভারী বেড়ি পরানো হবে। তারা যাতে পালাতে না পারে সে জন্য এ বেড়ি পরানো হবে না, বরং তা পরানো হবে এ জন্য যে, তারা যেন উঠতে না পারে। এ বেড়ি পালিয়ে যাওয়া রোধ করার জন্য নয় বরং শাস্তি বৃদ্ধি করার জন্য।

১৪. সে সময় পাহাড়সমূহের বিভিন্ন অংশকে পরস্পর সংযুক্ত রাখার কেন্দ্রীয় বল নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই প্রথমে তা মিহি বালুর স্তূপে পরিণত হবে। অতপর ভূমিকম্প গোটা পৃথিবীকে প্রবলভাবে কাঁপিয়ে তুললে বালুর এ স্তূপ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং গোটা ভূপৃষ্ঠ একটা বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত হবে। এ অবস্থার একটি চিত্র সূরা ত্বা–হার ১০৫ থেকে ১০৭ আয়াত পর্যন্ত এভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঃ "লোকেরা তোমাকে এসব পাহাড়ের অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলো, আমার প্রভু পাহাড়সমূহকে

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم
مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

২ রুকূ'

হে নবী,[১৮] তোমার রব জানেন যে, তুমি কোন সময় রাতের প্রায় দুই–তৃতীয়াংশ, কোন সময় অর্ধাংশ এবং কোন সময় এক–তৃতীয়াংশ সময় ইবাদাতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দাও।[১৯] তোমার সংগী একদল লোকও এ কাজ করে।[২০] রাত এবং দিনের সময়ের হিসেব আল্লাহই রাখেন। তিনি জানেন, তোমরা সময়ের সঠিক হিসেব রাখতে পারো না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এখন থেকে কুরআন শরীফের যতটুকু স্বাচ্ছন্দে পড়তে পারবে ততটুকুই পড়বে।[২১] তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক হবে অসুস্থ, কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে ভ্রমণরত,[২২] এবং কিছু লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে।[২৩] তাই কুরআনের যতটা পরিমাণ সহজেই পড়া যায় ততটাই পড়তে থাকো। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও[২৪] এবং আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে থাকো।[২৫] তোমরা নিজের জন্য যে পরিমাণ কল্যাণ অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহর কাছে প্রস্তুত পাবে। সেটিই অধিক উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে অনেক বড়।[২৬] আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

ধুলির মত করে ওড়াবেন এবং ভূপৃষ্ঠকে এমন সমতল বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত করবেন যে, তুমি সেখানে উঁচু নীচু বা ভাঁজ দেখতে পাবে না।"

১৫. মক্কার যেসব কাফের রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করছিলো এবং তাঁর বিরোধিতায় অতি মাত্রায় তৎপর ছিল এখানে তাদের উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে।

১৬. লোকদের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষী বানিয়ে পাঠানোর একটি অর্থ হলো, তিনি দুনিয়ায় তাদের সামনে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ পেশ করবেন। আরেকটি হলো আখেরাতে যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে সে সময় তিনি সাক্ষ দেবেন যে, এসব লোকের কাছে আমি সত্যের আহবান পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, টীকা ১৪৪; আন নিসা, টীকা ৬৪; আন্ নাহল, আয়াত ৮৪–৮৯; আল আহযাব, টীকা ৮২; আল ফাত্‌হ্‌, টীকা ১৪)

১৭. অর্থাৎ প্রথম তো তোমাদের এ ভয় করা উচিত যে, আমার প্রেরিত রসূলের কথা যদি তোমরা না মানো তাহলে এ একই অপরাধের কারণে ফেরাউন যে দুর্ভাগ্যজনক পরিণাম ভোগ করেছে অনুরূপ পরিণাম দুনিয়াতেই তোমাদের ভোগ করতে হবে। আর মনে করো, দুনিয়ায় যদি তোমাদের জন্য কোন আযাবের ব্যবস্থা নাও করা হয় তাহলেও কিয়ামতের আযাব থেকে কিভাবে নিষ্কৃতি পাবে?

১৮. ইতিপূর্বে তাহাজ্জুদ নামাযের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এ আয়াতের মাধ্যমে তা শিথিল ও সহজ করা হয়েছে। এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময়–কাল সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়াত আছে। মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম ও আবু দাউদে এ রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে যে, তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে প্রথম নির্দেশের পর এ দ্বিতীয় নির্দেশটি এক বছর পর নাযিল হয়েছিল এবং রাতের বেলার ইবাদাত–বন্দেগী ফরয পর্যায়ে না রেখে নফল করে দেয়া হয়েছিল। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম হযরত আয়েশা (রা) থেকেই আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ নির্দেশটি প্রথম নির্দেশের আট মাস পরে দেয়া হয়েছিল। হযরত আয়েশা থেকে ইবনে আবী হাতেম তৃতীয় আরেকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এতে পরবর্তী নির্দেশটি ষোল মাস পরে নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবু দাউদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এক বছর সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়েরের বর্ণনা হলো, নির্দেশটি দশ বছর পর নাযিল হয়েছিল (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম)। আমাদের মতে এ বর্ণনাটিই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তা মক্কায় নাযিল হয়েছিল এবং মক্কী যুগেরও একদম প্রথম দিকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতলাভের পর তখন বড়জোর চারটি বছর অতিবাহিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় রুকূ'র বিষয়বস্তুর স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে তা মদীনাতে নাযিল হয়েছিল বলে মনে হয়। তখন কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং যাকাত ফরয হওয়ার নির্দেশও দেয়া হয়েছিল। তাই এ দু'টি রুকূ'র নাযিল হওয়ার সময়কালের মধ্যে অনিবার্যভাবে কম করে হলেও দশ বছরের ব্যবধান হওয়া উচিত।

১৯. প্রাথমিক নির্দেশে যদিও অধিক রাত বা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী সময় নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছিল। কিন্তু নামাযে নিমগ্নতার কারণে সময়ের আন্দাজ বা

পরিমাপ ঠিক থাকতো না। আর সে সময় ঘড়িও ছিল না যে, সময় ঠিকমত পরিমাপ করা যাবে। সুতরাং কোন সময় দুই–তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত ইবাদাতে কেটে যেতো আবার কোন সময় তা হ্রাস পেয়ে শুধু এক–তৃতীয়াংশের মত হতো।

২০. প্রথম পর্যায়ে নির্দেশ দেয়ার সময় শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সম্বোধন করা হয়েছিল এবং তাঁকেই রাতে নামায পড়তে বলা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় মুসলমানদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ এবং নেকী অর্জনের যে অস্বাভাবিক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল সে কারণে অধিকাংশ সাহাবীও এ নামাযকে গুরুত্ব দিতেন এবং তা পড়তেন।

২১. কুরআন তেলাওয়াত দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণেই যেহেতু নামায দীর্ঘায়িত হয় সে জন্য বলেছেন যে, তাহাজ্জুদ নামাযে যতটা পরিমাণ কুরআন সহজে ও স্বাচ্ছন্দে পড়তে পার, ততটাই পড়। এভাবে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী নামায আপনা থেকেই হ্রাস প্রাপ্ত হবে। এ কথাটির শব্দমালা বাহ্যিকভাবে যদিও নির্দেশের মত, কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে, তাহাজ্জুদের নামায ফরয নয়, বরং নফল। হাদীসেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের জন্য দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ এ ছাড়া অন্য কিছু কি আমার জন্য অবশ্য করণীয়? জবাবে বলা হলো, 'না'। তবে তুমি স্বেচ্ছায় কিছু পড়লে, তা ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)।

এ আয়াত থেকে আরো একটি কথা জানা গেল যে, নামাযে রুকূ' ও সিজদা যেমন ফরয তেমনি কুরআন মজীদ পড়াও ফরয। কারণ আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য স্থানে যেমন রুকূ' ও সিজদা শব্দ নামায অর্থে ব্যবহার করেছেন তেমনি এখানে কুরআন পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এর অর্থ নামাযে কুরআন পড়া। এভাবে প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারে কেউ যদি একথা বলে আপত্তি উত্থাপন করে যে, তাহাজ্জুদের নামাযই যখন নফল, তখন সে নামাযে কুরআন মজীদ পড়া ফরয হয় কি করে? এর জবাব হলো, কেউ যখন নফল নামায পড়বে তখন নফল নামাযেরও সব শর্ত পূরণ করা এবং তার সব 'রুকন' ও ফরয আদায় করা আবশ্যক। কেউ একথা বলতে পারে না যে, নফল নামাযের জন্য কাপড় ও শরীর পবিত্র হওয়া, অযু করা এবং সতর থাকা ওয়াজিব নয় এবং নফল নামাযে দাঁড়ানো, বসা এবং রুকু' ও সিজদা করা সবই নফল।

২২. হালাল ও বৈধ উপায়ে রুজি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর মেহেরবানী ও করুণা অনুসন্ধান বলে আখ্যায়িত করেছে।

২৩. এখানে আল্লাহ তা'আলা হালাল রুজি উপার্জন এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উল্লেখ এক সাথে যেভাবে করেছেন এবং অসুস্থতা জনিত অক্ষমতা ছাড়া এ দু'টি কাজকেও তাহাজ্জুদ নামায এবং অব্যাহতি লাভের কিংবা তা কিছুটা লাঘব করার কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন তা থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামে বৈধ পন্থায় রুজি উপার্জন করা কত বড় মর্যাদার কাজ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ما من جالبٍ يجلبُ طعاماً الى بلدٍ من بلدان المسلمين فيبيعه لِسِعْرِ يومِه الا كانت منزلته عند الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرون يضر بون فى الارض ....

যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন শহর বা জনপদে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে এবং সে দিনের বাজার দরে তা বিক্রি করে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পড়লেন واخـــرون يـضـربـون فـى الارض .... (ইবনে মারদুইয়া)

হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

ما من حال ياتينى عليه الموت بعد الجهاد فى سبيل الله احب الى من ان ياتينى وانا بين شعبتى جبل التمس من فضل الله وقرأ هذه الاية –

আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া আর কোন অবস্থায় প্রাণ দেয়া আমার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় হয়ে থাকলে তা হলো এই যে, আমি আল্লাহর অনুগ্রহ বা মেহেরবানী অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কোন গিরিপথ অতিক্রম কালে সেখানে মৃত্যু এসে আমাকে আলিঙ্গন করছে। তার পর তিনি এ আয়াতটি পড়লেন। (বায়হাকী ফী শু'আবিল ঈমান)

২৪. এখানে নামায কায়েম করা এবং যাকাত দেয়া বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায এবং ফরয যাকাত বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ সবাই একমত।

২৫. ইবনে যায়েদ বলেন ঃ এর অর্থ যাকাত দেয়া ছাড়াও নিজের অর্থ–সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করা। এ খরচ আল্লাহর পথে জিহাদ করা, আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করা, জনকল্যাণমূলক কাজ করা কিংবা অন্যান্য কল্যাণকর কাজেও হতে পারে। আল্লাহকে কর্জ এবং উত্তম কর্জ দেয়ার অর্থ কি তার ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে করেছি। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, টীকা ২৬৭; আল মা–য়েদাহ, টীকা ৩৩ এবং আল হাদীদ, টীকা ১৬)।

২৬. এর অর্থ হলো, আখেরাতের জন্য যা কিছু তোমরা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছো তা তোমাদের ঐ সব জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী যা তোমরা দুনিয়াতেই রেখে দিয়েছো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করোনি। হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ايكم ماله احب اليه من مال وارثه "তোমাদের এমন কেউ আছে যার নিজের অর্থ–সম্পদ তার উত্তরাধিকারীর অর্থ–সম্পদের চেয়ে তার কাছে বেশী প্রিয়? জবাবে লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রসূল, আমাদের মধ্যে কেউ–ই এমন নেই যার নিজের অর্থ–সম্পদ তাঁর কাছে তার উত্তরাধিকারীর অর্থ–সম্পদ থেকে বেশী প্রিয় নয়।" তখন তিনি বললেন ঃ 'তোমরা কি

বলছো তা ভেবে দেখো।' লোকেরা বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমাদের অবস্থা আসলেই এরূপ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

انما مال احدكم ماقدّم ومال وارثه ما اخّر

তোমাদের নিজের অর্থ-সম্পদ তো সেইগুলো যা তোমরা আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছো। আর যা তোমরা রেখে দিয়েছো সেগুলো ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের অর্থ-সম্পদ। (বুখারী, নাসায়ী ও মুসনাদে আবু ইয়ালা)।